❝ যখন দেখবে কেউ অনর্থক বিষয়ে মগ্ন, তখন বুঝে নিবে ওই ব্যক্তি থেকে আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।[১]

❝ অনর্থক কথা ও কাজ পরিত্যাগ করাই হচ্ছে একজন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য।[২]

১. হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ
২. মিশকাতুল মাসাবীহ : ৪৮৩৯

লেখিকার কথন

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾

হিসেবের কাঁটায় জীবনটা ক্ষুদ্র। তবে, এই ক্ষুদ্রতার মধ্যেই প্রত্যাশা, স্বপ্ন, ইচ্ছে, লক্ষ্য, করণীয়সহ নানা নামক বিশালতা নিহিত। এই বিশালতাকে বহন করে বেড়ানো ক্ষুদ্র জীবন আবার সময়ের মাঝে আবদ্ধ। কিন্তু, এই সময়ের প্রয়োজনীয়তা ঠিক কী? সময় হচ্ছে এক প্রকার অদৃশ্য অস্তিত্ব, যা পরিমাপযোগ্য। জন্মের মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া একটি সীমা। এই এতটুকু পরিমাপযোগ্য সীমা অর্থাৎ সময়ের ওপর ভিত্তি করেই আদায় করা হবে জবাবদিহিতা। শুরু থেকে শেষ অবধি প্রত্যেকটি কাজের পেছনে ব্যয় করা সময়ের হিসেব। যে হিসেব আদায় করবেন স্বয়ং আমাদের রাব্ব আল্লাহ ﷻ। আমাদের জীবন আমাদের নিকট একটি আমানত। যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে আল্লাহর আইন তথা দ্বীন আল-ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণের বেষ্টনী দ্বারা। আত্মসমর্পণ হচ্ছে সেই চুক্তি যেখানে বিনা শর্তে বিনা বাক্যে নিঃসংকোচে নিজ অধিপতির হাতে নিজের আদ্যোপান্ত-আপাদমস্তক ন্যস্ত করে দেওয়া হয়। রাব্বে কারীমের সঙ্গে আমাদের চুক্তিও ঠিক সেরূপ যেখানে কোনো প্রকার প্রশ্ন, সন্দেহ, সংকোচ কিংবা বিরোধিতার কোনো সুযোগ নেই। অতএব, জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে আল্লাহর আইন পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়ন করা আমাদের ওপর আবশ্যক। যদিও নাফসের ধোঁকায় ও শাইত্বানের ওয়াসওয়াসায় আমরা বারংবার গুনাহে হাত ডুবিয়ে ফেলি আর বনে যাই নাফরমান। তবে, তন্মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক

হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহে জড়িয়ে পড়া ও তার ওপর অটুট থাকা এবং ছোট ছোট গুনাহ্‌কে গুনাহ্‌ হিসেবে বিবেচনা না করা অথবা হালকাভাবে নেওয়া। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি আমাদের মাঝে গুনাহ্‌কে গুনাহ্‌ বলে অস্বীকার করা, হারাম বিষয়াদিকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে হালালাইজ করতে উঠেপড়ে লাগা, যুক্তির পিঠে যুক্তি নিক্ষেপ করে হারামকে স্বাভাবিক করার অপচেষ্টা চালানো, ধর্মীয় বেশে ফেতনার বিস্তার ঘটানোর মতো রোগ প্রগাঢ়রূপে গেঁড়ে বসেছে। ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে জড়িয়ে যাওয়া এইসকল গুনাহ্‌ ধীরে ধীরে আমাদের ক্বলবে প্রজ্বলিত দ্বীনি নূরকে নিভিয়ে ফেলে। অথচ 'ইয়ামুদ দ্বীনে' মানবজাতির নিকট হতে দুনিয়াতে কৃত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রত্যেকটি কাজের জবাবদিহিতা আদায় করা হবে। এজন্যই মুমিন মাত্রই নিজেকে গুনাহ্‌মুক্ত রাখার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো অপরিহার্য।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতবশত হয়ে যাওয়া এসব ছোট-বড়ো গুনাহ্‌গুলো অনায়াসেই আমাদের দ্বারা রোজ বা হরহামেশাই সংঘটিত হচ্ছে। যা থেকে নিজেকে ও অন্যদের হেফাজতে রাখা অবশ্যই কাম্য।

উপরোক্ত এমনই সংশ্লিষ্ট কিছু পয়েন্টকে কেন্দ্র করে সতর্কীকরণের স্বার্থেই এই অজ্ঞের হাতে কলম তুলে নেওয়া। পয়েন্ট আকারে বর্ণনার পাশাপাশি বইয়ের প্রতিটি অংশের যথাযথ রেফারেন্স উল্লেখ করে যথাসাধ্য বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করার চেষ্টা করেছি। বইটির ভাষা ও শারঈ সম্পাদনা এবং একাধিকবার নজর বুলানোসহ বিভিন্ন কাজে অনেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

রাইয়ান প্রকাশনের পুরো টিম এবং পাঠকসহ এ বই সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ ﷻ জাযায়ে খায়ের দান করুন, কল্যাণের সহিত এই বইয়ের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করুন এবং প্রকাশক ও সম্পাদকদের আরও অধিক ইলমী ও দাওয়াতী কাজ করার তাওফিক্ব দান করুন। আমিন!

যেহেতু এটি কোনো ওয়াহী নয়। তাই, যেকোনো প্রকার ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। মানুষ মাত্রই ভুল হয়। যদিও আমরা বইয়ের খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় রেফারেন্সসহ, বানান এবং অন্যান্য প্রত্যেকটা বিষয় অত্যন্ত যত্ন সহকারে সর্বোচ্চ নির্ভুল রাখার চেষ্টা করেছি। তবুও যদি কোনো সচেতন

পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো রকম ভুল পরিলক্ষিত হয় তাহলে, তা সম্মানের সহিত আমাদের অবগত করার জন্য বিনীত অনুরোধ পেশ করছি।

পরিশেষে, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর সাহাবীগণ, পরিবার-পরিজন, বংশধর ও ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করবেন, তাঁদের সকলের প্রতি। আমাদের সর্বশেষ বিবৃতি এটাই যে—'সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি গোটা জগৎসমূহের প্রতিপালক, পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু ও বিচার-দিবসের মালিক। হে আমাদের রাব্ব, আসমান ও যমীনসমূহের স্রষ্টা। দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। সবকিছুর রব ও মালিক। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি—আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। আমরা আমাদের নাফসের ক্ষতি থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি, শাইত্বান ও তার চেলাদের অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! পথনির্দেশপূর্ণ কাজে আমাদের আপনি দৃঢ় রাখুন। আমরা যা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি, ভুল করি, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বশত করি, যা জেনে করি এবং না-জেনে করি— এই সবকিছুতে আমাদের আপনি ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যই এবং তাঁর দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তনকারী।'

দু'আর মুহতাজ
কাশফিয়া দিশা
১১ মুহাররম, ১৪৪৪ হিজরি।

সমর্পণ

সেই সত্তা, যার হাতে আমার জীবন এবং মৃত্যু, আমার সকল ইবাদাত, আবেদন-নিবেদন ও ভালোবাসার একমাত্র ও সর্বোত্তম মালিক, একচ্ছত্র প্রতিপালকের জন্য।

সূচিপত্র

বিলাসিতার চাদরে অপচয় ১১
ফুডগ্রাফি ৩১
ফটোগ্রাফির মোড়কে সীমালঙ্ঘন..... ৩৯
অজান্তে আত্মসাৎ ৪৭
প্রশংসা নাকি খুন? ৮৪
কুধারণা ৯৬
বিনোদন বিভ্রান্তি ১১৪
অসুস্থ ট্রেন্ড ১২৫
লৌকিকতার ফাঁদে..... ১৩১
প্লিজেন্ট্রি.....১৪১
ডিজাইন.....১৫৮
ক্রিচার্স (প্রাণী) ভেক্টর আর্ট ১৬২
প্রাণীর ছবি বিকৃত করা ১৭৬
হিসবাহ.....১৮৩
আমি শুনলাম এবং মানলাম!.....২০৪

বিলাসিতার চাদরে অপচয়

পৃথিবী নামক চরাচরে বিচিত্র মানুষের বসবাস। এদের মধ্যে কেউ আছে ভোজন রসিক। রসনা বিলাসে তারা গোটা দুনিয়ায় ছুটে বেড়ায়। কেউ আবার পেটের তাগিদে খাবারের পিছনে জীবন বিলায়। নির্বিশেষে সবাই খাবারের প্রতি কম-বেশি দুর্বল। কেউ ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পরিশ্রম করে, কেউ উদরপূর্তির জন্য, কেউ একবেলা খেয়ে বাঁচার জন্য লড়াই করছে, কেউ আবার একদিনে ছয়বেলা খাওয়ার জন্য পাঁয়তারা চালাচ্ছে। ইসলামে পানাহারে অতিরঞ্জন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কেননা তা অপচয়। আবশ্যকীয় খরচ ও বৈধ খরচেও সীমা অতিক্রম করাকে অপচয় হিসেবে গণ্য করা হয়। আল্লাহ ﷻ আমাদের আদেশ করেছেন,

وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

> ‘তোমরা পানাহার করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।’[১]

জীবন ধারণের জন্য পানাহার অপরিহার্য। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতিকে অতিরিক্ত পানাহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, অতিরিক্ত পানাহার যেমন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তেমনই নৈতিকতার দৃষ্টিতেও গর্হিত ও অন্যায়। কারণ, পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদন, খাদ্যের জোগান ও সরবরাহের মাত্রা সীমাবদ্ধ ও সীমিত বা পরিমিত। সামর্থ্যবান ও সুবিধাভোগী মানুষ প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে আবশ্যিকভাবে সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের অভুক্ত থাকতে হবে বা প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগান থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তাছাড়াও খাদ্যের পেছনে ‘অতিরিক্ত’ অর্থ অপচয় করা ইনসাফের পরিপন্থি। হাদিস শরিফে এমন অপচয় থেকে সর্তকতাস্বরূপ ইরশাদ হয়েছে–

‘‘আল্লাহ ﷻ তোমাদের জন্য তিনটি (কর্ম) অপছন্দ করেছেন:

---

১. সূরা আল-আ'রাফ ০৭/ আয়াত : ৩১

১. অনর্থক কথাবার্তা,
২. সম্পদ নষ্ট করা এবং
৩. অত্যধিক সওয়াল করা।''[১]

ইবনু আব্বাস (রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা) এই অপচয়কে সংজ্ঞায়িত করে বলেন,

من أنفق مائة ألف في حق فليس بسرف، و من أنفق درهما في غير حقه فهو سرف.

'প্রকৃত স্থানে হাজার দিরহাম খরচও অপচয় নয়, আর অনর্থক এক দিরহাম খরচও অপচয় বা ইসরাফ'।[২]

'ইসরাফ' (إسراف) শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘন, অপচয়, অপব্যয়, অমিতব্যয়, বাড়াবাড়ি, মাত্রাতিরিক্ততা, অপরিমিতি। কতিপয় বিদ্বান এই 'ইসরাফ' শব্দকে ব্যয় করা ও খাওয়ার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ শরিফ জুরজানি (রাহিমাহুল্লাহ্) (৭৪০-৮১৬ হিজরি) 'ইসরাফ'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

الإسراف هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس وتجاوز الحد في النفقة، وقيل: أن يأكل الرجل ما لا يحل له، أو يأكل مما يحل له فوق الاعتدال، ومقدار الحاجة-

'ইসরাফ হলো কোনো হীন উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। কেউ কেউ বলেন, কোনো ব্যক্তির অবৈধ বস্তু ভক্ষণ করা অথবা তার জন্য যা কিছু হালাল তা অপরিমিত ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা'।[৩]

ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শায়বানি (রাহিমাহুল্লাহ্) অপচয় ও অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এভাবে, 'তৃপ্ত হওয়ার পরেও খাওয়া, বৈধ জিনিস অতিরঞ্জিত করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার দস্তরখানা বা পাত্রে রাখা, রুটির পার্শ্ব বাদ

১. সহিহুল বুখারি : ১৪৭৭
২. ইমাম কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন (বৈরূত: দারু ইহয়্যাইত তুরাসিল আরাবি, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি.), ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৩।
৩. শরিফ জুরজানি, কিতাবুত তারীফাত (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৫ হি.), পৃ. ৩৮

দিয়ে শুধু মাঝখান থেকে খাওয়া, রুটির যে অংশ ফুলে উঠে শুধু সেই অংশটুকু খাওয়া যেমনটি কেউ কেউ করে থাকে, কোনো লোকমা হাত থেকে পড়ে গেলে তা আর না উঠানো ইত্যাদি স্পষ্ট অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

অনুরূপভাবে ফকিহগণ ইসরাফের সমার্থক 'তাবযীর' (অপব্যয়)-কে এক্ষেত্রে উল্লেখ করে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে যে,

عدم إحسان التصرف في المال وصرفه فيما لا ينبغي.

> 'তাবযীর বা অপব্যয় হচ্ছে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার না করা এবং তা অনুচিত কাজে ব্যয় করা'।[১]

আল্লাহর অবাধ্যতায় (গুনাহমূলক কাজে) খরচ করা অপব্যয় এবং আল্লাহর পথে খরচ না করা হচ্ছে কৃপণতা। আল্লাহর নির্দেশানুসারে ও তাঁর আনুগত্যের পথে খরচ করা হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।[২] অনুরূপ আবশ্যকীয় খরচে ও বৈধ খরচেও সীমা অতিক্রম করাও অপব্যয় বলে গণ্য।

একজন মুমিনের জন্য অপব্যয় হোক কিংবা অপচয়, উভয় থেকেই বিরত থাকা অত্যাবশ্যকীয়। এর মানে এই নয় যে, অপচয় রোধ করতে গিয়ে সে কৃপণতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ ﷻ কৃপণদের পছন্দ করেন না। মূলত অপচয় ত্যাগ করার অর্থ হলো মিতব্যয়ী হওয়া, ব্যয় ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

> আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে।[৩]

---

১. ইমাম নববি, তাহরিরু আলফাযিত তানবিহ্ (দামেশক: দারুল কলম, ১৪০৮ হি.), পৃষ্ঠা: ২০০।

• 'তাবযীর' (التبذير) অর্থ অপচয়, অপব্যয়, বাজে খরচ, অমিতব্যয় ইত্যাদি। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল القاء البذر وطرحه। অর্থাৎ, বীজ ছিটানো ও নিক্ষেপ করা। এ থেকে শব্দটি রূপকভাবে অর্থ-সম্পদ অযথা ব্যয় করার অর্থে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (রাগিব ইস্পাহানি, আল-মুফরাদাত, পৃ. ৪০)

২. ফাতহুল কাদির

৩. সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৬৭

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। উক্ত আয়াতে إِسْرَافٌ এবং এর বিপরীতে إِقْتَارٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। إِسْرَافٌ এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরিয়তের পরিভাষায় ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইবনু জুবায়ের (রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুম)-এর মতে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে কোনো কিছু ব্যয় করা হচ্ছে إِسْرَافٌ তথা অপব্যয়; যদি তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ এবং অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, تَبْذِيْرٌ তথা অনর্থক ব্যয় আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গুনাহ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

‘নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।’[১]

ইসলামে মাত্রাতিরিক্ত ভোজন সীমালঙ্ঘনের আওতাভুক্ত; যা অপচয়ের প্রথম কাতারে পড়ে। অথচ এই সীমালঙ্ঘনই এখন আমাদের জীবনের সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এটাকে মাকরুহ বলেছেন। পেট ভরে যাওয়ার পর আরও বেশি খাদ্য গ্রহণ করা মূলত মাকরুহের অন্তর্ভুক্ত, যা নিতান্তই অপছন্দনীয়।[২] এখন মুড সুয়িং হলেই আমরা বসে যাই মুড তথা নাফসের চাহিদার

১. সূরা আল-ইসরা (বনি-ইসরাঈল) আয়াত: ২৭

২. খাবারের ক্ষেত্রে শরিয়তের স্তর ও বিধান রয়েছে। তা হলো- **১.** ফরজ। পানাহার না করলে মারা যাবে, এমন সময় মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খাবার গ্রহণ করা ফরজ। কেউ যদি এ সময় পানাহার না করে মারা যায় তাহলে গুনাগার হবে। **২.** সওয়াব পাবে। নামাজে দাড়ানোর সক্ষমতার জন্য, রোজা সহজে রাখার জন্য, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের জন্য কেউ যদি পানাহার করে তাহলে সওয়াব পাবে। **৩.** মুবাহ বা বৈধ। কেউ যদি তৃপ্ত হয়ে খায় শুধু শরীরের শক্তি বর্ধনের জন্য তাহলে কোনো সওয়াবও হবে না আবার গুনাহও হবে না। **৪.** হালকা হিসেব হবে। কেউ যদি পেট ভরার পরও খায় তাহলে হালকা হিসেব হবে। তবে যদি পরের দিন রোজা রাখার শক্তি পেতে বা জিহাদের শক্তি পেতে বা খাবার থেকে উঠে গেলে মেহমান লজ্জায় ভালো করে খাবে না তখন তাকে সুযোগ দিতে তার সঙ্গে পেট ভরার পরও খায় তাহলে হিসেব হবে না। গুনাহও হবে না। **৫.** নাজায়েজ। এই পরিমাণ কম খাওয়ার মাধ্যমে সাধনা করা যে, ফরজ আদায় করতে দুর্বল হয়ে যায়। তবে নফসকে ক্ষুধার্ত রেখে যদি ইবাদত আদায়ে অক্ষম না হয় তাহলে বৈধ হবে। তবে যে অবিবাহিত যুবক খাবার খেলে যৌন উত্তেজনা অনুভব করে। সে তা দমন করতে রোজা রাখবে। খাবার থেকে বিরত

জোগান দিয়ে পেট ও নাফসের খাহেশাত মেটানোর জন্য। হুটহাট ফুড ক্রেভিং[১] উঠলেই নির্দ্বিধায় শুরু করি মুঠো ভরে ভরে খাওয়া। অপ্রয়োজনে প্লেট ভরে ভরে আহার করা। মাহে রমযান এলে সারাদিন সাওম পালন শেষে ইফতারে ফল, ভাজাপোড়া, মুখরোচক হরেক রকম খাবার সাজিয়ে কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলা। তখন মাথায় একটুও আসে না যে, আমরা উদরপূর্তি করে এভাবে খাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি অথচ উম্মাহর আরেক অংশের একবেলা মোটা রুটিও জোটে না! আমরা যখন ইফতারের সময় নিজেদের সামনে বাহারি খাবারের থালা সাজিয়ে বসেছি, উম্মাহর বিধ্বস্ত মানুষগুলো সেই মুহূর্তে ইফতার শূন্য। সৌদি আলেমদের কাছে তারা ফাতওয়া জানতে চাচ্ছে–তাদের সাহরিতে খাবার কিছু নেই, ইফতারেও কিছু জোটে না, এমনকি একটা খেজুরও না; তাদের রোজা আদৌও আদায় হবে তো? বিস্ফোরণে মুখে ইট-বালু ঢুকে গেলে রোজা ভাঙবে না তো? সৌদি মুফতি এর উত্তর দিতে পারেননি, অঝোরে কেঁদেছেন। অথচ আমরা সেই প্রশ্নগুলো শুনতেই পাইনি! কেন জানেন? কারণ, আমরা তখন কব্জি ডুবিয়ে খেতে ব্যস্ত ছিলাম।

সীমা ছাড়িয়ে খাচ্ছি, খেতে খেতে খাবার নিয়ে ঠাট্টাও করছি; আমরা কত খাই, কত খেতে পারি তা নির্দ্বিধায় বলেও বেড়াচ্ছি। খাবারের জন্য অস্থির হয়ে উঠছি, পাগল হয়ে যাচ্ছি। খাবার নিয়ে এসব পাগলামির নতুন মুখরোচক নামও দিয়েছি 'ক্রেভিং'; অথচ সীমাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণকে ইসলাম সংজ্ঞায়িত করেছে পার্থিব লোভ-লালসা বলে। যা কিনা হারাম!

ইবনু আব্বাস (রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

'যা ইচ্ছা পানাহার করো এবং যা ইচ্ছা পরিধান করো, তবে শুধু দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকো।

থাকবে। শর্ত হলো ইবাদত আদায়ে অক্ষম হতে পারবে না। অর্থাৎ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। আর যে ব্যক্তি খাদ্য না থাকার ফলে বাধ্য হয়ে ক্ষুধার্ত থাকার ফলে ফরজ আদায় করতে দুর্বল হয় এবং এর ওপর ধৈর্য ধরে, সে সওয়াব পাবে। ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৪১৫, *মিশকাত আহমদ*

১. ফুড ক্রেভিং হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট খাবার খাওয়ার প্রতি তীব্র ইচ্ছা বা আকর্ষণ। এটি স্বাভাবিক ক্ষুধা বা রুচি থেকে আলাদা। সাধারণত চকলেট, মিষ্টি, ডেজার্ট-জাতীয় চিনিযুক্ত খাবার, কখনো নোনতা বা চর্বিযুক্ত খাবারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়। এটি মানসিক চাপের কারণে যেমন হয় তেমনি হরমোনাল কারণেও হয়। পুরোটাই নাফসের খাহেশাত নয়। তাই এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা উচিত। পুষ্টিবিদদের বক্তব্য হলো, ফুড ক্রেভিং সাধারণত ২০ মিনিট বা তারপর চলে যায়। এ সময়টুকু ধৈর্য্য ধরতে হবে। *মিশকাত আহমদ*

১. তাতে অপব্যয় অর্থাৎ প্রয়োজনের চাইতে বেশি হওয়া যাবে না এবং
২. গর্ব ও অহংকার থাকা যাবে না।[১]

ইমাম গাজ্জালি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ধীরে ধীরে কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি অধিক খাওয়ায় অভ্যস্ত, সে যদি হঠাৎ করে খাবার কমিয়ে দেয় তাতে তার শরীরে বিরূপ প্রভাব পড়বে। সহ্য হবে না। দুর্বলতা সৃষ্টি হবে ও ভারসাম্য হারাবে। আগে থেকে অল্প ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাওয়ায় অভ্যস্ত হতে হবে।

হযরত হাসান বসরি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মুসলমানের দৃষ্টান্ত হলো বকরি ছানার মতো; যার জন্য এক মুষ্টি পুরাতন খেজুর, এক মুষ্টি ছাতু ও এক ঢোক পানিই যথেষ্ট।[২]

খাদ্য দ্বারা এভাবে উদরপূর্তি করার বিরুদ্ধে বারংবার নিষেধাজ্ঞা এসেছে, কিন্তু এ-ব্যাপারে উদাসীনতা ও বেপরোয়া মনোভাব ছাড়া আমাদের থেকে আর কোনও আচরণ কি পাওয়া যাবে? হাদিস শরিফে এহেন অতিরিক্ত পানাহারকে কাফেরদের পানাহারের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে, 'কাফির সাত পেটে আহার করে অর্থাৎ বেশি খায়, আর মুমিন এক পেটে আহার করে অর্থাৎ কম খায়।'[৩]

অন্য এক রেওয়ায়েতে মিকদাম বিন মা'দিকারিব (রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: 'মানুষ পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো পাত্র ভর্তি করে না। (তবে যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে পাত্র থেকে ততটুকু খাদ্য উঠানো কোনো ব্যক্তির জন্য দূষণীয় নয়)। যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব, ততটুকু খাদ্যই কোনো ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও যদি কোনো ব্যক্তির নফস (প্রবৃত্তি) জয়যুক্ত হয়, তবে সে তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।'[৪]

---

১. মিশকাত হা. ৪৩৮০
২. ফাযায়েলে সাদাকাত
৩. সহিহ বুখারি, ৫৩৯৩, ৫৩৯৪, ৫৩৯৫, ৫৩৯৬, ৫৩৯৭, মুসলিম, হা/২০৬২, ২০৬৩, ৬০৬৩, ৬০৬৪, মুসনাদে আহমাদ হা/৭৭৭৭, ১৫২২০, (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯৯২, ৪৯৯৪, ৪৯৯৫, ৪৯৯৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৮৮, ৪৮৯১, ৪৮৯২)
৪. সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৩৩৪৯, জামে তিরমিযি হা/২৩৮০, মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৭৩৫, শারহুস সুন্নাহ হা/৪০৪৮, ইরওয়া হা/২৩৮০, আত-তা'লিকুর রাগিব ৩/১২২, সহিহাহ হা/২২৬৫।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা সীমালঙ্ঘন ও অহংকার করে খেও না, দান করো এবং পরিধান করো।"[১]

অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করা সাহাবায়ে কেরামগণ (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহুম)-ও পছন্দ করতেন না। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্‌শার (রাহিমাহুল্লাহ্) কর্তৃক নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত, ইবনু 'উমার (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু) ততক্ষণ পর্যন্ত আহার করতেন না যতক্ষণ না তার সঙ্গে খাওয়ার জন্য একজন মিসকিনকে ডেকে আনা হতো। একদা তার সঙ্গে বসে খাওয়ার জন্য নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ্) এক ব্যক্তিকে নিয়ে এলেন। উক্ত ব্যক্তি অনেক বেশি আহার করে ফেলায় ইবনু 'উমার (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু) বললেন: 'নাফি'! এমন মানুষকে কখনো আমার কাছে নিয়ে আসবে না।'[২]

আতিয়্যাহ বিন আমির আল-জুহানি (মাকবূল)-এর সূত্রে আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, আমি সালমান (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু)-এর নিকট শুনেছি, তাকে আহার করতে পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি বলতেন, 'আমার জন্য যথেষ্ট যে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, দুনিয়াতে যেসব লোক ভূরিভোজ করে (পেট ভরে কিংবা অতিরিক্ত খায়), তারাই হবে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত'[৩]

হযরত মুআজ ইবনু জাবাল (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু) বলেন,

'যে ব্যক্তি তিন কাজে জড়িয়ে পড়বে, সে নিজেকে মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র বানিয়ে ফেলবে:

১. আশ্চর্য হওয়ার মতো কোনো কারণ ছাড়াই হাসা।
২. রাতভর ঘুমানো। (রাতে কিছু সময় জেগে ইবাদত বন্দেগি না করা)
৩. ক্ষুধা না লাগা সত্ত্বেও আহার করা।'[৪]

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর সর্বপ্রথম যে বিদআত প্রকাশ পায়- সেটা হলো উদরপূর্তি। নিশ্চয় মানুষের পেট যখন পরিতৃপ্ত হয়, তখন তাদের শরীর মোটা হয়ে যায়, অন্তর কঠিন হয়ে যায়, তাদের নফস দ্রুত বেগে দুনিয়ার দিকে ধাবিত হয়।'

---

১. সুনানে নাসাঈ হা/২৫৫৯, ৫/৭৯, সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৩৬০৫
২. সহিহুল বুখারি হা/৫৩৯৩, ৫৩৯৪; মুসলিম ৩৬/৩৪, হা/২০৬০, মুসনাদে আহমাদ হা/১৫২২০, আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯৯২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৮৮
৩. সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৩৩৫০, ৩৩৫১, জামে তিরমিযি হা/২৪৭৮, সহিহাহ হা/৩৪৩, মিশকাত হা/৫১৯৩
৪. আয যুহদুল কাবির- ৪৩৭

একজন দাঈ ইলাল্লাহ এই একবিংশ শতাব্দীর মানুষের খাবার-দাবার নিয়ে বলেন, "We eat, because we are bored". প্রকৃতপক্ষেই তাই। কিছু করার নেই, তো চলো কিছু খাই; ভালো লাগছে না, আচ্ছা চলো কিছু খাই; কাজ আছে, তো চলো কাজ করতে করতেই খাই। এক রুম থেকে আরেক রুমে যাচ্ছি আর গিলছি, ফ্রিজ খুলে কিছু না কিছু মুখে দিচ্ছি, পেটে ক্ষুধা নেই তারপরও কিছু না কিছু চিবুচ্ছি! আমরা এখন আর বাঁচার জন্য খাই না, বরং খাওয়ার জন্য বাঁচি। যা কিছু হবে হোক, আমাদের পেট সবসময় ভর্তি। বিশাল বিশাল সব ভুঁড়ি নিয়ে আমরা নির্লিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যেন এটা আমাদের কাছে মোটেই কোনো লজ্জাকর বিষয় নয়। এমনকি যারা উম্মাহর মুকতাদা; আদর্শ ও অনুকরণীয় তাদের কাছেও না, তারাও এই ভুঁড়ি নিয়ে কত স্বাচ্ছন্দ্যে! অথচ এক ভুঁড়িওয়ালাকে দেখেই আমিরুল মুমিনিন উমার (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু) বলেছিলেন, **'এটা হচ্ছে আল্লাহর আযাব!'**[১]

আশ্চর্য না! আমরা এখন নিজেদের শরীরে আযাবের সাদৃশ্য বহন করে চলছি? মুড সুয়িং হলেই আমাদের খাওয়া শুরু; জাওজ (স্বামী)-কে নিয়ে রাত-বিরাতে যখন তখন রেস্টুরেন্টে দৌড়; হুটহাট ক্রেভিং ওঠা; ইচ্ছে হলেই দু'হাতে খাওয়া; এগুলো কি আদৌও যুক্তিসম্মত?

কখনো কি চিন্তামগ্ন হয়েছি, যা করছি তা কতটুকু প্রয়োজনীয়? এভাবে গোগ্রাসে খাওয়া কতটুকু শরিয়তসম্মত? এরূপ কাজ করতে কি আমাদের একবারও বিবেকে বাধে না? টাকা থাকলেই কি আমাদের খেতে হবে? আমাদের মধ্যে কি জবাবদিহিতার কোনো ভয় নেই? ওয়াল্লহি! হাশরের ময়দানে এক পয়সারও হিসাব দিতে হবে; যে জিহ্বা দ্বারা আজ স্বাদ আস্বাদন করিয়ে করিয়ে আল্লাহর যিকির থেকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, একদিন সেই জিহ্বাই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে; এসব ভেবে কি আমাদের আত্মা কেঁপে উঠে না? পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারতে গিয়ে পাঁচ'শ-হাজার টাকা নিমিষে উড়িয়ে আসছি, সেখান থেকে অসহায়দের মাঝে সাদাকাহ্‌র জন্য কি একশো টাকাও ধার্য রেখেছি?

সাদাকার জন্য আমাদের হাত থেকে ৫০ টাকাও বের হতে বাধে, বিভিন্ন ওয়াসওয়াসার সম্মুখীন হই! আমাদের পাশের বাসার প্রতিবেশির হক সম্পর্কে আমরা গাফেল! ওয়েব চ্যারিটি সাইটে উঁকি দেওয়ার সামর্থ্য ও সময় আমাদের হয় না! অথচ মুমিন নাম নিয়ে এক আল্লাহর সামনে সিজদাহ দিয়ে অন্যত্র হাসতে হাসতে অপচয়কারী ওরফে শয়তানের ভাই-বোনের খাতায় নাম লিখিয়ে আসছি!

---

১. আল জু' লি ইবনু আবিদ দুন'ইয়া, হা/পৃষ্ঠা: ৪৩; বাংলা অনুবাদ: সালাফদের ক্ষুধা (অনুবাদক: মাসঊদ আলিমি)

আমার নবী ﷺ ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। আবু ত্বালহা (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু) বলেন, 'খন্দকের যুদ্ধে যখন আমরা খাদ্যসংকটে পড়ে গেলাম, তখন আমরা রাসূল ﷺ-এর নিকট আমাদের ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা জানালাম। আমরা পেটের কাপড় সরিয়ে বেঁধে রাখা একটি করে পাথর দেখালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কাপড় সরিয়ে আমাদের দু'টি পাথর দেখালেন।' পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। অথচ মদিনাতে হিজরত করার পর থেকে তাঁর ﷺ ওফাত অবধি এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও তাঁর পরিবার পরপর তিনদিন পেটপুরে কখনো খেতে পাননি।[১] কখনো দু-তিনটি খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করেছেন। কখনো একাধারে কয়েক দিন পর্যন্ত অভুক্ত থেকেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দীর্ঘ ১০ বছরের খাদেম আনাস (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের কাছে কোনো সন্ধ্যাকালেই এক সা[২] গম বা এক সা অন্য কোনো খাদ্যদানা অবশিষ্ট থাকত না। অথচ তাঁর ৯ জন স্ত্রী ছিল।'[৩]

আম্মাজান আয়েশা (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহা) বলেন, 'রাসূল ﷺ-এর পরিবারবর্গ লাগাতার দু'দিন যবের রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হননি। আর এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়েছে।'[৪]

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের ওপর দিয়ে মাস কেটে যেত, অথচ আমরা এর মধ্যে ঘরে (রান্নার) আগুন জ্বালাতাম না। আমরা শুধু খুরমা ও খেজুরের ওপর দিনাতিপাত করতাম। তবে যৎসামান্য গোশত আমাদের কাছে আসত।'[৫]

আবু সালামা আয়েশা (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারবর্গের কোনো কোনো মাস এমনভাবে অতিবাহিত হতো যে, তাদের কারো ঘরের চুলা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যেত না। আবু সালামা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে তাদের খাবার কী ছিল? তিনি বলেন, দুটি কালো জিনিস। খেজুর ও পানি।[৬]

---

১. সফিয়্যুর রহমান আল-মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩০৪; ওয়ালী উদ্দিন, আল-খতীব, প্রাগুক্ত; ২/৪৪৮।

২. ১ সা = ৩২৭০.৬০ গ্রাম (প্রায়) অর্থাৎ ৩ কেজি ২৭০ গ্রামের কিছু বেশি। সূত্র : মাসিক আলকাউসার, জুলাই-আগস্ট ২০১১, আওযানে শরইয়্যাহ, মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. পৃ. ১৮, *মিশকাত আহমদ*

৩. বুখারি, মিশকাত হা/৫২৩৯; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৫০১০।

৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৭; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৫০০৮।

৫. বুখারি হা/৬৪৫৮; মিশকাত হা/৪১৯২।

৬. ইবনু মাজাহ হা/৪১৪৫

ইবনু আব্বাস (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার-পরিজন একাধারে কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। তাঁর পরিবারে রাতের খাবার জুটত না। আর বেশির ভাগ সময় জবের রুটিই ছিল তাদের খাদ্য।'[১]

ফাজালা বিন উবায়েদ (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন, তখন কিছু লোক অসহনীয় ক্ষুধার জ্বালায় সালাতে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যেত। তারা ছিল সুফফার লোকজন। তাদের অবস্থা দেখে বেদুইনরা বলত, এরা পাগল নাকি? রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, 'আল্লাহর কাছে তোমাদের যে কী মর্যাদা রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা আরও বেশি ক্ষুধার্ত ও আরও বেশি অভাব অনটনে থাকতে পছন্দ করতে।'[২]

মুহাম্মাদ বিন সিরিন বলেন, একদা আমরা আবু হুরায়রা (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তার পরিধানে ছিল লাল মাটি রংয়ের দু'টি কাতান কাপড়। তিনি একটি কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'বেশ! বেশ! আবু হুরায়রা আজ কাতান কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে। অথচ আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমি ক্ষুধার তাড়নায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বর ও আয়েশা (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহা)-এর কামরার মাঝখানে পড়ে থাকতাম। এ পথে কেউ এসে আমার ঘাড়ের ওপর পা রাখত এবং ধারণা করতো যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। অথচ আমার মধ্যে কোনো পাগলামি ছিল না; বরং ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার এরূপ অবস্থা হতো'।[৩]

আবু হুরায়রা (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু) একবার এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে বকরি ভুনা পেশ করা হয়েছিল। যা খাওয়ার জন্য আবু হুরায়রা (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু)-কে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। অথচ জবের রুটি দ্বারাও পরিতৃপ্ত হতে পারেননি।'[৪]

---

১. তিরমিযি হা/২৩৬০; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১১৯।
২. তিরমিযি হা/২৩৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৬৯।
৩. সহিহ বুখারি হা/৭৩২৪; জামে তিরমিযি হা/২৩৬৭।
৪. সহীহ বুখারী, ৫৪১৪; মিশকাত হা/৫২৩৮

নুমান বিন বাশির (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু) বলেন, 'তোমরা তো এখন ইচ্ছামতো পানাহার করতে পারছ, অথচ আমি তোমাদের নবী ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি এই শুকনো খেজুরও পেতেন না, যা দ্বারা তাঁর পেট ভরাতে পারেন।'[১]

সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক! সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল! জান্নাতের ঝাণ্ডা যার হাতে, হাউজে কাউসারের মালিকানা যার হাতে, শাফাআতের গৌরবে যিনি মহিমান্বিত, যার পায়ের স্পর্শ না পাওয়া অবধি সকল ইনসানের জন্য জান্নাত হারাম, যার এক কথায় উহুদ পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হয়ে তার পায়ের তলায় এসে পড়ে থাকত, সেই মানুষটিও ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। পেটপুরে খেতে পারেননি। আজীবন যুহদ চর্চা করে কাটিয়েছেন।

আর আমরা আজ তাঁর উম্মাহ হয়ে ভরপেট থেকেও আবারো খাওয়ার জন্য মুখের সামনে খাবারের ডালা সাজিয়ে বসি। অথচ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য দৈনিক ১৮০০ কিলোক্যালরিই যথেষ্ট। তবুও আমাদের মাথাপিছু খাদ্যব্যয় এর ঢের বেশি। উন্নত দেশগুলোতে এর পরিমাণ মাথাপিছু ৩৭০০ এর ঊর্ধ্বে! আর আমাদের দেশে ২৫০০ এর ঊর্ধ্বে অর্থাৎ যথেষ্ট কিলোক্যালরির তুলনায় প্রায় ৭০০ বেশি।[২] এই অতিরিক্ত খাদ্যের জোগান দেওয়া হয় বিশ্বের অন্যপ্রান্তের মানুষদের বঞ্চিত করে, দরিদ্রদের প্রাপ্য মেরে।

আমাদের খাদ্য ক্রয় করা ও বিলাসিতার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে পরীক্ষাস্বরূপ। যার অপব্যবহারের দায়িত্ব আমরা নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছি। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই আশঙ্কা থেকেই বলেছিলেন, 'তোমাদের দারিদ্র্য নিয়ে আমি আশঙ্কা করি না। বরং আমার আশঙ্কা হয়, তোমরা দুনিয়ার প্রাচুর্যের অধিকারী হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা হয়েছিল আর তোমরা প্রতিযোগিতা শুরু করবে যেমনটা তারাও করেছিল, তখন দুনিয়া উল্টো তোমাদের ধ্বংস করবে যেমন তাদের করেছিল।'[৩]

এ কথারই সত্যতা নিশ্চিত করে উমার ফারূক (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু) বলেছেন, 'বিপদ দিয়ে আমাদের পরীক্ষা করা হয়, আমরা ধৈর্য ধারণ করি। আর প্রাচুর্য দিয়ে যখন আমাদের পরীক্ষা করা হয়, আমরা অধৈর্য হয়ে পড়ি।'[৪]

---

১. সহিহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯৫; জামে তিরমিযি হা/২৩৭২।

২. https: //en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_food_energy_intake

৩. সহিহ বুখারি হা/৩১৫৮

৪. বাসাইরু জাবিত তামইজ ফি লাতাইফিল কিতাবিল আজিজ, খণ্ড : ০২, পৃষ্ঠা : ২৭৪-২৭৫

বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের ক্ষমতা আল্লাহর তরফ থেকেই মুমিনদের জন্য পরীক্ষা। যে সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

‘জেনে রেখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনা (পরীক্ষা)।’[১]

এই পার্থিব সমৃদ্ধির গ্রাস বা ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমিরুল মুমিনিন আলি (রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহু) ইরশাদ করেছেন, ‘হে আদমসন্তান, ধন-ঐশ্বর্যে উল্লাস করো না। দারিদ্র্যে হতাশ হয়ো না। বিপদ-আপদে পেরেশান হয়ো না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে উন্মত্ত হয়ো না। স্বর্ণ কিন্তু আগুন দিয়েই পরখ করা হয়।’[২]

যে শরীরকে আমরা আজ ভরপেট খাইয়ে-দাইয়ে পালছি, একদিন সেই শরীরই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। প্রকাশ করে দেবে প্রকাশ্য-গোপনীয় সবকিছু। যেমনটা ইরশাদ হয়েছে আল-কুরআনের সূরা আন-নূরে–

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

‘যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, তাদের পা- তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে।’[৩]

অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

‘নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর সবক'টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।’[৪]

সেদিন যখন এই জিহ্বা হতে গুনে গুনে জবাবদিহিতা আদায় করা হবে তখন আমাদের পরিণতি কী হবে? এই বিলাসবহুল পানাহারের অভ্যাস, হুটহাট ওঠা

১. সূরা আন-আনফাল ০৮/ আয়াত: ২৮
২. রিসালাতুল মুসতারশিদিন, পৃষ্ঠা : ৮৫
৩. সূরা আন-নূর ২৪/ আয়াত: ২৪
৪. সূরা আল-ইসরা (বনী ইসরাইল) ১৭/ আয়াত: ৩৬

ক্রেভিংয়ের জবাবদিহিতা কীভাবে দেব আমরা? তবুও দিতে হবে! নিআমতের হিসাব অবশ্যই দিতে হবে। কেননা স্বয়ং আল্লাহ ﷻ-ই বলেছেন,

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

'অতঃপর সেদিন তোমাদের নিআমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'[১]

এই নিআমতের জবাবদিহিতার ভয়ে সাহাবায়ে কেরাম [রদ্বিইয়াল্ল-হু আনহুম] শরবত খেতে গেলেও হিসাবের ভয়ে কাঁপতেন। সেখানে অপচয়, টাকা ওড়ানো, ফুর্তি, শো অফ করেও যদি আমরা হকের ওপরেই আছি ভেবে নিশ্চিন্তে এভাবেই চলতে থাকি তাহলে দিনশেষে এই লেলিয়ে পড়া নাফস্ আমাদেরই গ্রাস করবে, ক্ষতিগ্রস্ত আমরাই হবো। কেননা, যে জিহ্বাকে বিরত রাখতে জানেনি, খাওয়ার ক্ষেত্রে নাফসের লাগাম বাঁধতে পারেনি, সে দুনিয়াবি অর্থ সম্পদেও আদৌ লাগাম বাঁধতে পারবে কিনা তা নিয়ে আলাদা করে প্রশ্ন তোলাই বাহুল্য।

এই ক্ষণিকের মুসাফিরি জীবনের কীসের ধোঁকা আমাদের গ্রাস করেছে? আমার টাকা, আমার ইচ্ছা, আমার হক, বুঝিয়ে বুঝিয়ে শয়তান আমাদের নাফসকে ক্রমশ কব্জা করে ফেলছে। কেন বুঝতে পারছি না আমরা? কেন উপলব্ধিশক্তি হ্রাস পেয়েছে আমাদের? সংশোধিত হওয়ার সময় কি হয়নি এখনো?

وفقنا الله تعالي ان نفهم ونعمل هذه الموضوع.

آمين يا رب العالمين.

১. সূরা আত-তাকাসুর ১০২/ আয়াত: ৮